Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা সাদেকা পারভীন

রোলঃ 227022079

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা সাদেকা পারভীন

রোলঃ 227022079

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা সাদেকা পারভীন, আইডিঃ 227022079 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছা সাদেকা পারভীন

আইডিঃ 227022079

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'য়ালার। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং শুধুমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি সমস্ত অকল্যাণ থেকে। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর তিনি যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। দরুদ এবং সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। যা কিছু ঠিক তা মহান আল্লহর পক্ষ থেকে আর যা কিছু ভুল তার জন্য আল্লহ আমাকে মাফ করুন।

ভূমিকা:

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। কখনো মা হিসেবে, কখনো স্ত্রী হিসেবে, কখনো মেয়ে হিসেবে, আবার কখনো বোন হিসেবে।

ইসলাম আগমনের আগে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, ঘৃণিত। তখন তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করা হতো।

কন্যাসন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্মম ঘটনাও ঘটেছিল সে সময়। ইসলাম এসে এই বর্বরতা রুখে দিয়েছে। ইসলাম সম্মান নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। একসময় নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো, ইসলাম তা কঠোরভাবে বন্ধ করেছে।

নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলাম প্রয়োজনীয় সব বিধান দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে সুরা 'নিসা' (অর্থ : নারী) নামে একটি সুরাও আছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যখন কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহপাক ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। তারা এসে বলে-পরিবারের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তারা তাদের বাহু দিয়ে কন্যা সন্তানটিকে আবেষ্টন করে এবং তার মাথায় হাত রেখে বলে, এক অবলা হতে আর এক অবলা বের হয়েছে। যে ব্যক্তি এর রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হবে সে কেয়ামত পর্যন্ত সাহায্য পাবে। "

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কারো কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হলে সে যদি তাকে পুঁতে না ফেলে, তাকে যদি সে অপমানিত না করে এবং তাকে উপেক্ষা করে যদি সে পুএসন্তানের পক্ষপাতিত্ব না করে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ)।

নারীবাদের সংজ্ঞা ও ধারণা :

নারীবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা লিঙ্গ নির্বিশেষে নারী-পুরুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতার কথা বলে।
মূলত পশ্চিমা দেশে এই মতবাদের শুরু হলেও, বিশ্বব্যাপী এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, এবং নারীর অধিকার ও নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নারীবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
নারীবাদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে কয়েকশ' বছর আগে ইউরোপের সামাজিক প্রেক্ষাপট মূল ভূমিকা রেখেছিল। সেসময় নারীর জন্য গৃহ এবং গৃহস্থালি ব্যাপারগুলো নির্দিষ্ট করে রাখা ছিল, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল না এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল না।

বিশ্লেষকেরা বলেন, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে লিঙ্গীয় আধিপত্য অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যকে দেশে দেশে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ।

ম্যারিয়াম ওয়েবস্টার-এর মতে ‘পুরুষের মতো নারীকেও সমান অধিকার ও সুযোগ দান করা উচিত এমন বিশ্বাসই নারীবাদ।’

উইকিপিডিয়ার মতে ‘নারীবাদ হচ্ছে একটি ভাবাদর্শিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সাম্য সৃষ্টি।’

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে ‘নারীবাদ হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমতায় বিশ্বাস।’

অর্থাৎ নারী পুরুষ এক ও অভিন্ন, তাদের অধিকারও এক ও অভিন্ন। তাই তাদের সুযোগ-সুবিধাও পুরুষের মতো হতে হবে। তাই এসব অধিকার অর্জনের আন্দোলনই নারীবাদী আন্দোলন বলে পরিচিত।

নারীবাদের উদ্ভব পাশ্চাত্যে হলেও সারা দুনিয়ায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে। নারীবাদীরা সর্বত্র নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবিদার।

নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্যসমূহ:

অনেকগুলো লক্ষ্য নিয়ে নারীবাদীরা কাজ করছে। বিশেষত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভের অধিকার, ন্যায্য মজুরী ও বেতন লাভ, মজুরীর ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করা, নারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, বিয়ের ক্ষেত্রে সমানাধিকার, মাতৃকালীন ছুটি লাভ, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানী ও ধর্ষণ থেকে নারীকে রক্ষার আইনগত প্রতিবিধান ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে আরো কিছু বিষয় নারী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। যেমন নারীর যে কোন পোশাক পরার অধিকার, নারীর যৌন স্বাধীনতা ও সন্তান ধারণ করা অথবা না করার স্বাধীনতা, নারী পুরুষ নিরপেক্ষ ভাষা প্রয়োগ, কর্মবণ্টনের ক্ষেত্রে সমাজে কিছু কাজ পুরুষসুলভ ও কিছু কাজ নারীসুলভ এ ধারণার অবসান ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায় পুরুষের মতোই যাবতীয় অধিকার অর্জন করাই নারীবাদের লক্ষ্য।

পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থা কি ছিলো :

প্রায় সতের শ বছর ধরে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান গ্রন্থ বাইবেল। এই বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বিধান অনুযায়ী এবং গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি ও সমাজে (নিউ টেস্টামেন্ট-এর সময়ে) বিয়ে, সমাজ ও সরকার সবকিছুতে পুরুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিলো।

বাইবেলের মতে, 'শাসন স্বামীর হাতে থাকবে। খোদার নির্দেশ বলে স্বামীকে মান্য করতে স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। স্বামী গৃহে ও রাষ্ট্রে সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালনা করবে, পুরুষরা যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করবে এবং তার অধীনস্থ সবকিছুর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তার উপর থাকবে। নারীরা ঘরে বসে থাকবে, সে তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না।' (লুথার লেকচার)

প্রকৃত কথা হচ্ছে 'নারীদের কাজ হচ্ছে পুরুষের সঙ্গ দেয়া, যাতে করে সে নেতৃত্ব, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অগ্রবর্তী হতে পারে।' (কার্ল বার্থ, চার্চ ডগমেটিকস)

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 'আদি পুস্তক অনুযায়ী নারীদের পুরুষের পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই নারীদের অবস্থান পুরুষদের নিচে। স্রষ্টার প্রতিবিম্ব পুরুষদের উপর নারীদের চেয়ে অতি উজ্জ্বলতরভাবে আপতিত হয়েছে।' (Woodhead, Linda (2004). Christianity: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. pp. n.p.)

খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী নারীরা পাপের আধার, 'আদি পাপের' জন্য নারীই দায়ী। তাই নারী ধর্মীয়ভাবেই ছিলো নিম্নশ্রেণীর-দুষ্টু, পাপীয়সী। কালে কালে নারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে পুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে। নারী সঙ্গ পুরুষের জন্য বরাবরই ক্ষতিকর বিবেচনা করা হয়েছে। তাছাড়া সামাজিকভাবেও নারীদের তেমন কোন মর্যাদা প্রদান করা হয়নি।
গোটা মধ্য যুগে বাইবেল ও পাদ্রীদের মতামতকে ভিত্তি করেই খ্রিস্টীয় সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো এবং ১৯ শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিলো যদিও তা ছিলো ভাঙ্গনের মুখে। সমগ্র পাশ্চাত্যের ইতিহাসে নারীরা শুধু গৃহস্থালী কাজেই আবদ্ধ ছিলো। আর পুরুষরা ছিলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজে নিয়োজিত। মধ্য যুগে ইউরোপে নারীদের সম্পত্তির অধিকারী হওয়া, লেখাপড়া অথবা জনজীবনে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ বা অধিকার ছিলো না। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে জনসম্মুখে মহিলাদের মাথা ঢাকতে বাধ্য করা হতো। জার্মানীর কোন কোন অঞ্চলে স্ত্রীদের বিক্রয় করা পর্যন্ত স্বামীর অধিকার ছিলো। এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ইউরোপে নারীদের কোন ভোটাধিকার ছিলো না অথবা কোন পদে নির্বাচিত হওয়ারও অধিকার ছিলো না। নারীরা তার পুরুষ প্রতিনিধি (স্বামী, পিতা বা পুত্র) ছাড়া কোন ব্যবসায় জড়িত হতে পারতো না।

ইসলামে নারীর মর্যাদা:

নিম্নে ইসলামে নারীর সম্মান বিষয়ে কিছু তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

নারী যখন মা :

মহান আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআন-হাদিসে মাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।" (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের খেদমত করার এবং তাঁদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদীসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাকীদ করা হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে 'উঃ' শব্দটিও বলতে এবং তাঁদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সব কিছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

নারীরা হচ্ছে মায়ের জাতি। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।"

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, "এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এর পরও তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বলেন, তার পরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর তোমার পিতা।" (মুসলিম, হাদিস : ৬৩৯৪)

সুবহানাল্লাহ! এতে করে স্পষ্ট হয়ে যায়, ইসলাম সর্বোচ্চ নারীকে সম্মান দেয় বলেই আল্লাহর রাসুল (সা.) তাদের সম্মানের ব্যাপারে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন।

নারী যখন স্ত্রী :

নারী যখন স্ত্রী, তখনো তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ নারীদের তাঁর বিশেষ নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"

নারীদেরকে পুরুষদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করার অর্থ হল, পৃথিবীর প্রথম নারী মা হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্বের (পাঁজরের) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাঁদের দুই জন হতে মানুষের জন্মের (স্বাভাবিক) ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়েছে।

অর্থাৎ যদি পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা বস্তু হতে সৃষ্টি হত; যেমন যদি নারী জ্বিন অথবা চতুষ্পদ জন্তু থেকে সৃষ্টি হত, তাহলে তাদের উভয়ের একই বস্তু হতে সৃষ্টি হওয়াতে যে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় তা কখনই পাওয়া সম্ভব হত না। বরং একে অপরকে অপছন্দ করত ও জন্তু জানোয়ারের ন্যায় ব্যবহার করত। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহর অশেষ দয়া যে, তিনি মানুষের জুড়ি ও সঙ্গিনী মানুষকেই বানিয়েছেন।

مَوَدَّة এর অর্থ হল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুমধুর ভালবাসা যা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হয় অনুরূপ ভালবাসা পৃথিবীর অন্য কোন দুই ব্যক্তির মাঝে হয় না। আর رَحمَة (মায়া-মমতা) হল এই যে, স্বামী নিজ স্ত্রীকে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ দান করে থাকে। অনুরূপ স্ত্রীও নিজের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বামীর সেবা করে থাকে। মহান আল্লাহ উভয়ের উপরেই সে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, মানুষ এই শান্তি ও অগাধ প্রেম-ভালবাসা শুধুমাত্র শরীয়তসম্মত বিবাহের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে।

এই সম্পর্কে ইসলাম নারীকে রানির মর্যাদা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের

রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারি, হাদিস : ৫১৮৮)

নারী যখন মেয়ে :

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, সন্তানরা আল্লাহর নিয়ামত। আর মেয়েসন্তানরা পুণ্য। মহান আল্লাহ নিয়ামতের হিসাব নেন, আর পুণ্যের প্রতিদান দেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড় (প্রতিবন্ধক) হবে।" (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৩)

নারী যখন বোন :

ইসলাম মেয়ে এবং বোনের সঙ্গেও সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছে। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে।"০ (তিরমিজি, হাদিস : ১৯১২)

নারী যখন অনাত্মীয় :

নারী অনাত্মীয় হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের সৌন্দর্য। তার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকা সবার দায়িত্ব। ইসলামের ইতিহাসে নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় বনু কাইনুকা গোত্রের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এক সাহাবি তার মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষায় জীবন দিয়ে দিয়েছেন।

আবু আওন থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদি তাঁর মুখের নেকাব খোলানোর অপচেষ্টা করে, তাতে ওই নারী অস্বীকৃতি জানান। ওই স্বর্ণকার গোপনে মুসলিম নারীটির (অগোচরে) পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের ওপরে গিঁট দিয়ে দেয়, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। ফলে তিনি উঠতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। এ ভদ্র মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নরপিশাচের দল হো হো করে হাততালি দিতে থাকল। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক (প্রতিবাদী) মুসলিম ওই স্বর্ণকারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। প্রত্যুত্তরে ইহুদিরা মুসলিম লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে।

এরপর নিহত মুসলিমটির পরিবারবর্গ চিৎকার করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাছে ফরিয়াদ করেন। এর ফলে মুসলিম ও বনু কাইনুকার ইহুদিদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত বাধে। প্রায় ১৫ দিন সে গোত্রের দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর তাদের সবাইকে বন্দি করা হয়। (ইবনে হিশাম : ২/৪৭, আর রাহিকুল মাখতুম [বাংলা] : ২৪০/২৪২)

উম্মে সালামা (রা:)কে নিয়ে নারীবাদীদের অপপ্রচার:

কিছু নারীবাদী ঘরানার আধুনিক মুসলিম একাডেমিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তারা উম্মে সালামা (রা.) কে অভিহিত করেন 'প্রথম মুসলিম নারীবাদী' হিসেবে। হ্যা! তারা তাকে এ উপাধিই দিয়েছেন, 'প্রথম মুসলিম নারীবাদী'।

আধুনিক মুসলিম নারীবাদীরা উম্মে সালামা (রা.) এর জীবনের বহু ঘটনা চক্রান্তপূর্ণ উপায়ে বর্ণনা করে। এটাই আমাদের চোখ খুলে দেয়। এটাই তাদের আসল সমস্যা। তবে একইসাথে অতি রক্ষণশীল মুসলিমদেরও সমস্যা রয়েছে। পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর জুলুম করা, নারীদের মুখ একদম বন্ধ রাখার প্রবণতার মত বিষয়গুলো সমস্যাপূর্ণ। নারীবাদীদের দ্বারা উম্মে সালামা (রা.) এর ঘটনাগুলোর উদ্দেশ্যমূলক বর্ণনা প্রমাণ করে আধুনিক মুসলিম নারীবাদীরাও চরমপন্থার দিকে চলে গেছে। এভাবে চরম রক্ষণশীল ও ইসলামী নারীবাদীরা একে অপরকে রসদের যোগান দিচ্ছে। যেমনভাবে চরম ডানপন্থি ও চরম বামপন্থিরা একে অপরের রসদ জোগায়।

আমাদের বুঝতে হবে, নারীবাদীরা অতি রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভুত। আবার অতি রক্ষণশীলরা আরো অতি রক্ষণশীল হয়েছে নারীবাদীদের ভয়ার্ত রূপ দেখে। এখানে সমান্তরাল রাস্তার মত অবস্থা। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হল, আপনার প্রজ্ঞা ব্যবহার করতে হবে। বাগাড়ম্বর বিষয়গুলো উপেক্ষা করে দৃষ্টি ফেলতে হবে আমাদের।

এটা সত্য যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কিছু জেন্ডার রোল আছে। আরো কিছু জেন্ডার রোল আছে যা বায়োলজিক্যাল। একইসাথে বলতে হবে, জেন্ডার রোলের পরিসর রয়েছে। এমনকি কিছু নারী ও পুরুষ এ পরিসরের মধ্যে অবস্থান করেন না। তারা একটু এদিকে সেদিকে ভূমিকা রাখেন। এজন্য এ নিয়মভুক্ত ভূমিকাগুলোর ব্যাপারে আপনি যাই বলতে চাননা কেন, আপনি দেখবেন এমন নারী পুরুষ রয়েছে যারা তাদের ভূমিকার পরিসরের একদম সীমানার মধ্যে অবস্থান করেন না। এতে তেমন ভুল নেই।

আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হল, উম্মে সালামা (রা.) নারী অধিকার নিয়ে নবিজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, যা নারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত। উম্মুল মু'মিনিনদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এটা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, তার এমন আধ্যাত্মিক ও মানসিক যোগ্যতা তেমনই ছিল। প্রশ্ন করতে কোনো দোষ নেই। তিনি নবীজি (সা.) কর্তৃক

প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি যেসব প্রশ্ন নবীজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমাদের বোনেরা যদি এসব জিজ্ঞেস করেন তবে আমাদের ভাইরা বলে বসবেন, "এটা জিজ্ঞেস করার সাহস কি করে হল তোমার!"

কিন্তু যিনি নবিজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করছেন তিনি উম্মে সালামা (রা.); নবিজিরই স্ত্রী।

উম্মে সালামা (রা.) এর প্রথম প্রশ্ন:

নবিজি (সা.) কে খুব গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন উম্মে সালামা (রা.) । যেমন, একদিন তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সবসময় পুরুষদের নামই উল্লেখ করেন। নারীদের কেন নয়?" এখানে বোঝা যাচ্ছে, কেন আধুনিক মুসলিম নারীবাদীরা তাকে প্রথম মুসলিম নারীবাদী মনে করে। কারণ, এ প্রশ্নটি এ ধরণের প্যারাডাইম থেকেই আসছে- "আল্লাহ পুরুষদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, পবিত্র কুরআনে নারীরা তাহলে কোথায়?"

এর জবাবে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াত নাযিল করলেন। এটি অবশ্যই পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত একটি আয়াত-

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব, আয়াত নং-৩৫)

অত্র আয়াতে নারী ও পুরুষ উভয়কে সমহারে উল্লেখ করে বলছেন, তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং এ আয়াত থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই মহান আল্লাহর চোখে সমান। আর এটাই আসল সমতা। সত্যিকার সমতা এই দুনিয়ার নয়। দুনিয়াতে আমরা সকলেই আমাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কাজ ও কাজের ফলাফল লাভ করি। ডাক্তারকে ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব দেয়া হয় না। ইঞ্জিনিয়ারকে মেকানিকের দায়িত্ব দেয়া হয় না। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে। যদি ৪ বছরের ট্রেনিং কোর্স আপনাকে ভিন্ন দায়িত্ব অর্পন করে, তাহলে বায়োলজিক্যাল জন্ম বা নারী-পুরুষ হিসেবে জন্ম নেয়ার ক্ষেত্রে নয় কেন?

আল্লাহ প্রদত্ত্ব কিছু জেন্ডার রোল রয়েছে, আবার সমাজ ও সংস্কৃতি গঠিত কিছু জেন্ডার রোল রয়েছে। কিছু জেন্ডার রোল সংস্কৃতি থেকে আসে। কিছু জেন্ডার রোল সমাজগঠিত, তবে সব জেন্ডার রোল নয়। আর এটা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে,

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى

"কোন পুরুষ নারীর মত নয়।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩৬)
পয়েন্ট হল, যদি পূর্বোল্লিখিত সূরা আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াত খেয়াল করা যায় তবে সেখানে ভালো কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন ভালো কাজের প্রসঙ্গ আসে, তখন কোনো বৈষম্য নেই। নারী ও পুরুষ যিকির করেছে, আল্লাহ এক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর তুলনায় বেশি প্রতিদান দেবেন না। যিকির, সালাত ও সদকাহের প্রতিদান কোনো নারীকে পুরুষের তুলনায় বেশি বা কম দিবেন না। আল্লাহ আয়াতটিতে প্রায় এক ডজন ভালো কাজ উল্লেখ করেছেন, সুতরাং আল্লাহ বলেছেন ভালো কাজের প্রতিদান প্রাপ্তিতে সবাই সমান। এখানে কোনো সমস্যা নেই।

উম্মে সালামা (রা.) এর দ্বিতীয় প্রশ্ন:

উম্মে সালামা (রা.) কর্তৃক রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসিত দ্বিতীয় প্রশ্নে যাই। তিনি নবীজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুহাজিরদের প্রশংসা করেছেন। নারী মুহাজিরদের কথা আসে নি কেন?" আপনারা জানেন, আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশী, অতি দয়ালু।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২১৮)।

এখানে আল্লাহ পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ 'هَاجَرُوْا' ব্যবহার করেছেন। এজন্যই উম্মে সালামা (রা.) জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে নারী মুহাজিরদের কথা আসে নি কেন? মহান আল্লাহ তার এ প্রশ্নের জবাবে সূরা আলে ইমরানের ১৯৫ নম্বর আয়াত নাযিল করেন। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আল্লাহ তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। এটি উম্মে সালামা (রা.) এর আরেকটি মর্যাদা। 'নারীবাদী ইস্যু' সম্পর্কিত তার জিজ্ঞাসিত কমপক্ষে তিনটি প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন। যাহোক, আল্লাহ তার এ প্রশ্নের জবাব সূরা আলে ইমরানে দিয়েছেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
"তাদের রব তাদেরকে জবাব দিয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯৫)
কি জবাব দিয়েছেন?

ۚاَنِّیۡ لَاۤ اُضِیۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡکُمۡ مِّنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের, নারী হও বা পুরুষ কারো আমলই (আমলের প্রতিদান) নষ্ট করবো না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯৫)

লক্ষ্য করুন, সমান পুরস্কার। আল্লাহর শপথ! এটা সুস্পষ্ট। কেউ এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই উপস্থাপন করতে পারবেন না। পবিত্র কুরআনে সমতা প্রদান করা হয়েছে, সওয়াবের সমতা। এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সমতা। আল্লাহর প্রতি উবুদিয়্যাহ এর সমতা। কেবল পুরুষ বলেই কোনো পুরুষ কখনোই নারীদের থেকে অধিক উত্তম ইবাদতকারী নয়। এটাই হল সত্যিকার সমতা। পবিত্র কুরআনে এটি অতি সুস্পষ্ট।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ বলছেন, ۚ بَعۡضُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ "তোমরা প্রত্যেকে একজন অন্যজন থেকে এসেছো" বা "তোমরা একে অপরের অংশ"।(সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯৫)

অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ এসেছে নারী ও পুরুষ (পিতা-মাতা) থেকে, প্রত্যেক নারীও নারী ও পুরুষ (পিতা-মাতা) থেকে এসেছে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত সমতা। মানুষ কিভাবে একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পিতা-মাতা থেকে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ জোড়া থেকে এসেছি। আমরা একজন আরেকজনের নিকট প্রয়োজনীয়।

এরপর বলা হচ্ছে,

فَالَّذِیۡنَ هَاجَرُوۡا وَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِیَارِهِمۡ وَ اُوۡذُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِیۡ وَ قٰتَلُوۡا وَ قُتِلُوۡا لَاُکَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَیِّاٰتِهِمۡ وَ لَاُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۚ

"সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯৫)

অত্র আয়াতে ৫ টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে-

- এক. যারা হিজরত করেছে।
- দুই. যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।
- তিন. যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে।
- চার. যারা যুদ্ধ করেছে।
- পাঁচ. যারা নিহত হয়েছে।

আর এ আয়াতসমূহ নাযিলের ব্যাপারে উম্মে সালামা (রা.) এর হাদীস, "এ আয়াত আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে"। চমৎকার একটা বিষয় হলো, যে পাঁচটি বিষয় এ আয়াতে উল্লেখ আছে, ঠিক এগুলোর দ্বারাই উম্মে সালামা (রা.) কষ্ট ভোগ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! এটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

এ আয়াতটি আসলে উম্মে সালামা (রা.) এর সংক্ষিপ্ত জিবনী-

- এক. "যারা হিজরত করেছে" -উম্মে সালামা (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। এরপর হিজরত করেছেন মদিনায়।
- দুই. "যাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে" -তাকেও তো বের করে দেয়া হয়েছিল!
- তিন. "যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে" -নিপীড়ন! তাকে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তার ছোট্ট সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তিনি এতে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
- চার. "যারা যুদ্ধ করেছে" -তার স্বামী জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করেছেন।
- পাঁচ. "যারা নিহত হয়েছে" -তার স্বামী জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, তার জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী এ আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে তার জবাব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রকাশিত এ বিষয়টি উম্মে সালামা (রা.) এর মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত। এ ছিল উম্মে সালামার প্রশ্ন সম্পর্কিত দ্বিতীয় ওহী।

উম্মে সালামা (রা.) এর তৃতীয় প্রশ্ন:

এখন, আমাদের বুঝার জন্য মূল বিষয় হল, সমতা হল আধ্যাত্মিক, আখিরাতকেন্দ্রিক। জেন্ডার রোল হল ভিন্ন ভিন্ন। আর এটি উম্মে সালামা (রা.) এর প্রশ্নের তৃতীয় ঘটনায় জানা যায়। তিনি আরো একটি প্রশ্ন করেছিলেন অর্থাৎ তৃতীয় প্রশ্ন। মুজাহিদ ইবনে জাবের বলেন, নবিজি (সা.) কে উম্মে সালামা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নারীদের জন্য জিহাদে যাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষদের অনুমতি আছে। আর যখন উত্তরাধিকার সম্পদের ব্যাপার আসে, আমরা কেবল অর্ধেক পাই, পুরুষের তুলনায়।"

এখন, এখানে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন? তিনি বলতে চাচ্ছেন, আমাদের অর্থ সম্পদের উৎস পুরুষের তুলনায় কম। তা কিভাবে? গনীমত! হ্যা, এটাই। গনীমত হল অর্থ সম্পদ উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমাদের দোষ নয় যে আমরা জিহাদে যেতে পারি না। শরীয়াহ আমাদের বলেছে, তোমরা যেতে পারবে না। খালাস! আমরা যেতে পারব না। কিন্তু আমাদেরও তো অধিক অর্থ সম্পদ অর্জনের প্রয়োজন আছে। তিনি আসলে আক্ষরিকভাবে এটা বলেন নি। কিন্তু তিনি যেভাবে বলেছেন, তার মর্মার্থ এটাই। তিনি বলেছিলেন, "পুরুষ জিহাদে যেতে পারে, আমরা যেতে পারি না। এবং উত্তরাধিকারের বন্টনে আমরা অর্ধেক পাই (পুরুষের তুলনায়)।"

এখন, এ প্রশ্নের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জবাব উল্লেখের পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, এটা আপনাকে আসলেই দেখাবে নীতি-নৈতিকতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উম্মে সালামা (রা.) এ বিষয় দুটিতে (জিহাদে যাওয়া, গনীমত পাওয়া) দৃষ্টিপাত করে বলছেন, আমরা জিহাদে যেতে পারি না (অনুমতি নেই), এবং উত্তরাধিকার অর্ধেক পাই। অপরদিকে এই দুটি বিষয়ে ফোকাস করে পুরুষ সাহাবারা প্রশ্ন করেছিলেন, "নারীরা কেন আমাদের তুলনায় অর্ধেক উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে?" ঠিক এ দুটি বিষয়ই তারা উল্লেখ করেছিল। তাবারীসহ অন্যান্য স্কলারগণ বর্ণনা করেন, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলে সাহাবারা বলল,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাই তারা, যারা যুদ্ধ করতে যাই। নারীরা তো যায় না। তারা কিভাবে উত্তরাধিকার সম্পদ আমাদের তুলনায় অর্ধেক পেতে পারে?"

পুরুষ সাহাবীরা তাদের তুলনায় নারীদের অর্ধেক পাওয়াকে বেশি মনে করছেন। চিন্তা করুন! ভাবুন! নারী ও পুরুষ, উভয়ই একই বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তারা একদম পরস্পর বিপরীত দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এটাই হল নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার আসল বাস্তবতা। আপনি যেকোনো কোনা থেকে যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

আজকের নৈতিকতার দিকে তাকান। যৌনতা সম্পর্কিত চলমান নৈতিকতার দিকে তাকান। আপনি যেমন চান, তেমন যুক্তি দিতে পারবেন। আর তা নিজ নিজ দিক থেকে সঠিক মনে হবে। আমি কি বলছি তা আপনারা বুঝতে পারছেন? একই ইস্যুতে নারীরা একদিকে, পুরুষরা একদিকে। তারা একই বিষয় দেখছে, তারা জিহাদ ও গনীমতের বিষয়টি বিবেচনা করছে; আর দেখুন তারা কেমন পরস্পর বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করল। আর এজন্যই আপনার একজন উচ্চতর কর্তৃত্ববান প্রয়োজন, যিনি মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করে আপনার নিকট উপস্থাপন করবেন। ভুল ও সঠিক নির্ণয় করবেন। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেকোনো কিছুকে ভিত্তি করে যুক্তিতর্ক পেশ করতে পারে (কিন্তু অনেক সত্যই উদঘাটন করতে পারে না) ।

আমরা মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নৈতিকতার মানদণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর অনেক আধুনিক দার্শনিক আরো অন্যান্যরা বলে থাকেন, "ঈশ্বর ব্যতীত কোনো নৈতিকতা নেই।" অনেক বিখ্যাত দার্শনিক বলেন, "আপনি যখন ঈশ্বরকে কোন প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দেবেন, সেখানে কোনো নৈতিকতা থাকবে না।"

যাইহোক, আমরা আলোচনায় ফিরে যাই। উম্মে সালামা (রা.) এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে কোন আয়াত নাযিল হয়েছিল?

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَؕ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

“আর তোমরা সেসব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করো না, লোভ করো না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা সকলেই, নারী পুরুষ উভয়ই, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।” (সূরা নিসা আয়াত নং- ৩২)

আল্লাহর কাছে চান। আল্লাহ আপনাকে অন্য কোনোভাবে সন্তুষ্ট করবেন। সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অর্থ সম্পদই সব নয়। সম্ভবত নারীরা অন্য কোনো মাধ্যমে সন্তুষ্টি পাবে, পরিবার, সন্তানাদির মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো বৈধ উপায়ে। সম্ভবত অন্য কোনোভাবে সুখ সাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। এজন্যই আল্লাহ বলছেন,

وَ سۡـَٔلُوا اللّٰہَ مِنۡ فَضۡلِہٖ

“যাও! আল্লাহর কাছে ফযল প্রার্থনা করো।”

লক্ষনীয় যে আল্লাহ এ আয়াতে বলেন নি, তোমরা সমান। তিনি বলেছিলেন হিজরত, খুশু, যিকর, সাদাকাহ.. এসবের সওয়াব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু যখন এটি অর্থনৈতিক কারবার, দুনিয়ার কোনো বিষয়; সেক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন, দেখ! পুরুষ ও নারী আলাদা। আর এটাই আসল নারী অধিকার। আধুনিক পশ্চিমা পণ্ডিতরা যেসব নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সেটা নয়। এটা পশ্চিমা ভার্সন, যা তারা পবিত্র কুরআনের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। নারী ও পুরুষ সমান, পবিত্র কুরআন এটা বলে না। এক্ষেত্রে তাদেরকে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে ভিন্ন অর্থ বের করতে হবে বা বিকৃত করতে হবে। অথবা কুরআনের বক্তব্যকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যেমনটা তাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পুরোপুরিভাবে করছেন। এজন্যই তাদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত না। তারা ইবরাহীম (আ.) এবং অন্যান্যদের নিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করেন তাতে খুব হতাশ লাগে। তাদের এ ভাষা ব্যবহারের বিষয়গুলো সুপরিচিত। তারা তাদের ঈমান ও তারা যা করছে সেসব বিষয়ে আল্লাহর কাছে হিসাব দিবেন। এখানে যৌক্তিক পয়েন্টগুলো হলো, যদি কুরআনের বার্তা গ্রহণ না করেন, তাহলে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে করতেই শেষ হয়ে যাবেন। আর এটাই বাস্তবতা। যাহোক, ফেমিনিজম ইস্যু নিয়ে বক্তব্য সুস্পষ্ট, এসব ঘটনা (তার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও আল্লাহ কর্তৃক উত্তর) এবং এসবে তার প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন না করে উম্মে সালামা (রা.) এর বক্তব্য শুধু উদ্ধৃত করলে হবে না। তিনি কুরআনের আয়াত নাযিলের পর কোনো ধরণের আপত্তি করেন নি। কাহিনি শেষ! তিনি আল্লাহর জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। এটাই আসল ইসলামিক ফেমিনিজম,

“আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।” (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৮৫)।

যদি এরপরও প্রশ্ন করতে মন চায়, করুন! এর জবাবে আল্লাহ কি বলেছেন তা দেখুন। এগুলো আল্লাহরই বক্তব্য। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, নারী ও পুরুষ আধ্যাত্মিকভাবে (spiritually) সমান। তারা উভয়ই জান্নাতে যাবার জন্য সমান সামর্থ্য রাখে। কিন্তু দুনিয়াবি বিষয়ে নারী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সুযোগ ও অধিকার ভিন্ন। এখানে প্রতিযোগিতা নয়। তাদের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। তারা একে অপরের জন্য পরিপূরক। এ পদ্ধতিতেই সমাজ অধিক উত্তমভাবে পরিচালিত হবে। নারী ও পুরুষ প্রতিপক্ষ নয়। তারা একই টিমের। এই টিমের নাম 'পরিবার'। আপনারা একসাথে কাজ করবেন।

প্রত্যেকের পালন করার জন্য নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে। আর আল্লাহই এগুলো সব থেকে বেশি জানেন। হ্যা! আল্লাহই সবথেকে বেশি জানেন যে, নারীর জন্য কতভাগ সম্পদ উত্তম আর পুরুষের জন্য কতভাগ সম্পদ উত্তম। সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে জেন্ডার সমান নয়। বলা হচ্ছে,

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى

"পুরুষ কখনো নারীর মত নয়"। (সূরা আলে ইমরান, ৩৬)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ববান"। (সূরা নিসা, আয়াত নং-৩৪)

আবার,

وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"আর পুরুষদের তাদের উপর একটা মর্যাদা রয়েছে" (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২২৮)

পবিত্র কুরআন পাঠ করলে কোনোভাবেই থার্ড ওয়েভ বা পোস্ট মডার্নিস্ট ফেমিনিস্ট হওয়ার কথা না। পবিত্র কুরআন ও এ ধরণের ফেমিনিজম এ দুটি একইসাথে আসবে না। কেননা এ দুটি পরস্পর বিপরীত। ফেমিনিজম সংক্রান্ত আলোচনা এখানে এতটুকুই যথেষ্ট। যারা আয়িশা (রা.) , উম্মে সালামা (রা.) ও খাদিজা (রা.) কে ফেমিনিজমের আদর্শিক আইকন হিসেবে উদ্ধৃত করে, তারা এ মহিয়সী নারীদের জীবনীই অধ্যয়ন করে নি, অনুসরণ তো দূরের কথা।

আয়িশা (রা.) কে অনুকরণ করুন, উম্মে সালামা (রা.) এর মতো তাকওয়াবান ও ঈমানদার হোন। তাহলেই সম্মানিত হবেন। তাদের জীবন থেকে আপনার সুবিধামত একটা দুটো জিনিস নিয়ে বিকৃত উপস্থাপন করবেন না। তাদের জীবনের বাকি অংশগুলোকে এড়িয়ে যাবেন না। তাঁরা আপনার ফেমিনিজম ভার্সনের মত ছিলেন না। তারা সত্যিকারার্থেই মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তারা নিজেদের জীবনে নারীত্বকে (femininity) বাস্তবায়ন করেছেন, নারীবাদকে (feminism) নয়।

ইসলামে নারীবাদ:

নারীবাদের লক্ষ্য হল নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং পুরুষতন্ত্রের অবসান। কিন্তু ইসলামের বিধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে দেয়া হয়েছে। ইসলামে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছে। কোন নারী নবী বা রসূলের নাম কোরআনে নেই। ইসলামের কোন খলিফার পদ কোন নারী কখনও গ্রহণ করেনি। রসূল (সা) কোন নারীকে বিচারক বা গভর্নর পদে নিয়োগ দেননি কখনও।

নারী নেতৃত্ব বিরোধী সহি হাদিসও আছে;

by the hadith of Abu Bakrah who said that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) heard that the Persians had appointed the daughter of Chosroes as their queen, he said, "No people who appoint a woman as their leader will ever prosper." (Reported by al-Bukhari, 13/53).

পারস্যে একজন নারীকে শাসক হিসাবে রাণী বানানো হয়েছিল। নবীজি (সা) বলেছেন যে, "যারা নারীকে তাদের নেতা বানায় তারা কখনও সমৃদ্ধি অর্জন করবে না।"

সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে আছেঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।"

এই আয়াতে পুরুষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার দুটি কারণ বলা হয়েছে।

প্রথমটি হল, আল্লাহ প্রদত্তঃ যেমন, পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস এবং মেধাগত যোগ্যতা পুরুষের সৃষ্টিগতভাবেই নারীর তুলনায় অনেক বেশী।

দ্বিতীয়টি হল সব-উপার্জিতঃ এই দায়িত্ব শরীয়ত পুরুষের উপর চাপিয়েছে। মহিলাদেরকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে এবং তাদের সতীত্ব, শ্লীলতা এবং পবিত্রতার হিফাযতের জন্য ইসলাম বিশেষ করে তাদের জন্য অতীব জরুরী যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে সেই কারণেও উপার্জনের ঝামেলা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নেতৃত্ব দানের বিরুদ্ধে কুরআন কারীমের এটা এক অকাট্য দলীল। এর সমর্থন সহীহ বুখারীর সেই হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এমন জাতি কখনোও সফলকাম হবে না, যে জাতি তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোন মহিলার উপর অর্পণ করবে।"

স্ত্রী অবাধ্য হলে সর্বপ্রথম তাকে সদুপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বুঝাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সাময়িকভাবে তার সংসর্গ থেকে পৃথক হতে হবে। বুদ্ধিমতী মহিলার জন্য এটা বড় সতর্কতার বিষয়। কিন্তু এতেও যদি সে না বুঝে, তাহলে হালকাভাবে প্রহার করার অনুমতি আছে। তবে এই প্রহার যেন হিংস্রতা ও অত্যাচারের পর্যায়ে না পৌঁছে; যেমন অনেক মূর্খ লোকের স্বভাব। মহান আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) এই যুলমের অনুমতি কাউকে দেননি। 'অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অন্বেষণ করো না' অর্থাৎ, তাহলে আর মারধর করো না, তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করো না অথবা তাদেরকে তালাক দিও না। অর্থাৎ, তালাক হল একেবারে শেষ ধাপ; যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন তার প্রয়োগ হবে। কিন্তু বহু স্বামী তাদের এই অধিকারকে বড় অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে থাকে। ফলে সামান্য ও তুচ্ছ কারণে তালাক দিয়ে নিজের, স্ত্রীর এবং সন্তানদের জীবন নষ্ট করে থাকে।

ইসলামের বিধানে নারী এবং পুরুষের সমতা আছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর উপরে পুরুষকে রাখা হয়েছে।

সূরা বাকারা ২৮২ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓي اَجَلٍ مُّسَمًّي فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ ھُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ

بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰي ۗ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓي اَجَلِه ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓي اَلَّا
تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا
اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোন লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার উপর পাওনা সে (ঋণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার উপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু’জন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু’জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয় তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।”

সূরা বাকারা আয়াত ২২৮ এর শেষের অংশ;

"আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। "

সূরা বাকারা ২৮২ নং আয়াতের অংশ বিশেষ;

'যদি কর্জ-গ্রহীতা স্বল্প-বুদ্ধি অথবা দুর্বল কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু ন্যায্যভাবে বলে দেয় এবং তোমাদের আপন পুরুষ লোকের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক, যাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে তোমরা রাজী আছ, এটা এজন্য যে, যদি একজন ভুলে যায় (বা ভুল করে) তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হবে, তখন যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে। '

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হল দুই জন নারীর সাক্ষ্য কারণ নারীরা ভুলে যেতে পারে বা ভুল করতে পারে।
এখানে একজন পুরুষের মোকাবেলায় দু'জন মহিলার সমান হওয়ার কারণ ও যুক্তি আছে। অর্থাৎ মহিলা জ্ঞান ও স্মরণশক্তিতে পুরুষের থেকে দুর্বল। (যেমন মুসলিম শরীফের হাদীসে মহিলাকে কম জ্ঞানের অধিকারিণী বলা হয়েছে।) এখানে মহিলাকে ছোট ও তুচ্ছ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, একটি প্রাকৃতিক দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা; যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর কৌশলগত ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত। অহংকারবশতঃ কেউ যদি তা স্বীকার না করে, তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন। তবে প্রকৃতার্থে এবং বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা অস্বীকারযোগ্য নয়।

ইসলামে নারীর সম্মান:

নারীর পায়ের নিচে জান্নাত:

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। তা মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের মধ্যেই অগ্রগণ্য। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বারবার এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মা সন্তানের জন্য শুধু জন্মদাতাই নয়, বরং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে গাইড হিসেবে কাজ করেন।

ইসলামে মায়ের হকের অনেক বেশি গুরুত্ব।
তার খেদমত করা, তার প্রতি বিনম্র ও সম্মানসূচক আচরণ করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। মহান আল্লাহ মায়ের অধিকারকে এমন উচ্চস্থানে রেখেছেন যে, তা তার নিজের ইবাদতের পরেই স্থান পেয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন,

আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো। (সুরা লুকমান, আয়াত : ১৪)

নবিজি সা: কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম তিনবার মায়ের কথা বলেছেন। আর একবার বাবার কথা বললেন। (মুসলিম ২৫৪৮)

হে আল্লাহর রসুল! আমার সম্পদ আছে, আমার সন্তান ও আছে, আমার পিতা ও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী, এখন আমার করণীয় কী? রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম বললেন, "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার"। (ইবনে মাজাহ: ১৮৭০)

"মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিজি)
রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। তারাই তোমার জান্নাত আর তারাই তোমার জাহান্নাম।" (তিরমিজি)

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম বলেছেন-

“নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তির, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার বাবা-মা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করে জান্নাতের পথ সুগম করতে পারলো না।” (মুসলিম: ২৫৫১)

একবার মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমাহ আস-সুলামি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম-এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,
“হে আল্লাহর রসুল! আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আর এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। উত্তরে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম বলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআল্লাম বললেন, তাহলে তার খিদমতে লেগে থাক। কেননা (তোমার) জান্নাত তার দুপায়ের নিচে।” (নাসাঈ: ৩১০৪)

নারীর প্রতি ইনসাফ:
যখন আরবরা নারী সন্তান হলে কবর দিয়ে দিতো তখন ইসলাম নারীকে মোহর বুঝিয়ে দিয়ে বিয়ের হুকুম দিয়ে সম্মানিত করেছে।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا

“আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।”(সূরা নিসা আয়াত: ৪)

আবার যদি স্ত্রীদের সাথে সমতা করতে না পারে তবে একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা দেয়া হয়েছে।
সূরা নিসা আয়াত ৩ এ বলা হয়েছে,

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰي فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰي وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓي اَلَّا تَعُوْلُوْا ؕ

“আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু’টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।”

এই আয়াতের তাফসীর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিত্তশালিনী এবং রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ইয়াতীম কন্যা কোন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকলে, সে তার মাল ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ করে নিত, কিন্তু তাকে অন্য নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের ইয়াতীম মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা আছে। এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই বিয়ে কর অথবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, একজন মুসলিম পুরুষ (সে প্রয়োজন বোধ করলে) একই সময়ে চারজন মহিলাকে বিবাহ করে নিজের কাছে রাখতে পারে; এর বেশী রাখতে পারে না। অনেক সহীহ হাদীসেও এ বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে এবং চার সংখ্যা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, একজন মহিলাকেই বিবাহ করা যথেষ্ট হতে পারে। কেননা, একাধিক স্ত্রী রাখলে সুবিচারের যত্ন নেওয়া বড়ই কষ্টকর হয়।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" (আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি”।

সম্পদের উত্তরাধিকারে নারী :

এমন এক সময় ছিলো যখন নারীকে মানুষই গন্য করা হতো না, কিন্তু ইসলাম নারীকে সম্মানিত তো করেছেই, পুরুষের সাথে নারীকেও সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছে।

পুরুষরা নারীর অভিভাবকত্ব গ্রহন করা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পদের মালিকানা করা হয়।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

“পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে।”

ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে

পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির আবরণ পরিমাণ যুলমও করা হবে না। (সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৪)

এ বিশাল প্রতিদান দেখে বোঝা যায় আল্লাহ নারী পুরুষকে সমানভাবে পুরস্কৃত করবেন, তিনি নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ করেন না।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম। (তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২)

স্ত্রীর প্রতি সদাচারণ:

স্ত্রীর কাছে চারিত্রিক সনদ পেতে হলে তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। নিম্নে কোরআন-হাদিসের আলোকে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কিছু পদ্ধতি তুলে ধরা হলো—

স্ত্রীর মোহর আদায়ে যত্নবান হওয়া : নারীদের তাদের মোহর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেবে, অতঃপর তারা যদি সন্তোষের সঙ্গে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ করো।

(সুরা : নিসা, আয়াত : ৪)

স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া : স্ত্রী কখনো কোনো ভুল করে ফেলে তাকে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার না করে সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে বোঝানো। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা নারীদের

উত্তম নসিহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টি বেশি বাঁকা।
তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের নসিহত করতে থাকো। (বুখারি, হাদিস : ৩৩৩১)

সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেওয়া: মুআবিয়াহ আল-কুশাইরি (রা.) বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললাম, আমাদের স্ত্রীদের (হক) সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা-ই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তা পরিধান করাবে। তাদেরকে প্রহার করবে না এবং গালিগালাজ করবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ২১৪৪)

স্ত্রীর সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা : রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ শুনে নাও... সাবধান! তোমাদের ওপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সজ্জার ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি শোভনীয় আচরণ করবে।
(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৮৫১)

স্ত্রীর কোনো জায়েজ কাজকে ঘৃণা না করা : একেক মানুষের চিন্তা-চেতনা একেক রকম, তাই জায়েজ কোনো বিষয়ে স্ত্রীর কোনো অভ্যাস পছন্দ না হলেও তাকে ঘৃণা না করা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার কোনো (জায়েজ) অভ্যাসকে অপছন্দ করলে তার অন্য কোনো অভ্যাস সে পছন্দ করবে।’ (মুসলিম, হাদিস : ৩৫৪০)

স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ করা : আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন এবং একজন উটচালক তাঁদের উট হাঁকাচ্ছিল। রাসুল (সা.) বলেন, হে আনজাশাহ! কাচপাত্র নিয়ে আস্তে চলো। (মুসলিম, হাদিস : ৫৯৩৩)

স্ত্রীদের প্রতি যত্নশীল হওয়া : মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সব স্ত্রীর খোঁজ নিতেন এবং সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ফজরের নামাজের পর নবী (সা.) নামাজের স্থানে বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত লোকেরাও তাঁর চারপাশে বসে থাকত। অতঃপর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর

কাছে যেতেন, তাদের সালাম দিতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন আর যার দিন থাকত তার কাছে গিয়ে বসতেন। (তিবরানি, হাদিস : ৮৭৬৪)
এ ছাড়া রাসুল (সা.) প্রতি রাতে সব স্ত্রীদের একত্র করে তাঁদের খোঁজ নিতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, খুব কম দিনই হতো যে রাসুল (সা.) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে যেতেন না এবং তাদের সঙ্গে সহবাস ছাড়া ঘনিষ্ঠ (আলিঙ্গন ও চুম্বন) হতেন না। (আবু দাউদ, হাদিস : ২১৩৭)

চিত্তবিনোদন ও মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করা : স্ত্রীদের মানসিক প্রশান্তির জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকও করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন, তখন তিনি কিশোরী। রাসুল (সা.) সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। অতঃপর আয়েশা (রা.)-কে বলেন, এসো দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং দৌড়ে এগিয়ে গেলাম। (আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি, হাদিস : ৮৯৪৫)

সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করা : মহানবী (সা.) সাংসারিক কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, ‘নবী (সা.) জুতা ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমরা যেমন ঘরে কাজ করো তেমনি কাজ করতেন।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৫৩৮০)

মান-অভিমানে সহানুভূতিশীল হওয়া : স্ত্রীরা কখনো অভিমান করলে বা মন খারাপ করলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। এক সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এগিয়ে যান এবং সাফিয়া (রা.) পিছিয়ে পড়েন। এতে তিনি কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সা.) তখন নিজ হাতে তাঁর চোখ মুছে দেন এবং কাঁদতে নিষেধ করেন। (সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ি, হাদিস : ৯১৬২)

স্ত্রীদের সঙ্গে খুনসুটি করা : মহানবী (সা.) তাঁর আচার-আচরণে স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন এবং নানা খুনসুটি করতেন তাঁদের সঙ্গে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি ও রাসুলুল্লাহ (সা.) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, যা আমাদের মধ্যে থাকত। তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হলে আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন! আমার জন্য রাখুন!! (মুসলিম, হাদিস : ৩২১)

স্ত্রীদের অবদান স্বীকার করা : খাদিজা (রা.) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে তখন সে তার সম্পদ দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, আল্লাহ আমাকে তার গর্ভ থেকে

সন্তান দিয়েছেন যখন তিনি অন্য স্ত্রীদের সন্তান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৪৮৬৪)

উপসংহার:

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীর মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিছু কঠিন কাজ বা দায়িত্ব শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলি ছাড়া ইসলামে নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান। আত্মিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়েও পরহেজগার হতে পারে। নারী এবং পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক গঠনে পার্থক্য আছে। এই কারণেই আল্লাহ হেকমতের সাথে এই ধরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের বেহেশত। সন্তানের উপরে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে ৩ গুণ বেশী। পৃথিবীতে নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। কুরআনে নারী পুরুষকে একে অন্যের পোশাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ নারীবাদীরা আমাদের বোঝায় ইসলাম নারীকে সমানাধিকার দেয় না। প্রকৃতপক্ষে কঠিন, কষ্টদায়ক কাজ থেকে নারীকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে, পুরুষকে অধিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে নারীদের সাথে সদাচারনের নির্দেশ ও দেয়া হয়েছে । নারী বিদ্বেষ ভালো না, আবার পুরুষ বিদ্বেষও ভালো না। এটা ইসলামের শিক্ষা না। নারী, পুরুষ মিলেই সমাজকে সুন্দর করতে হবে যার যার সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

সুতরাং, পরিবারের কর্তা হল পুরুষ। আয় রোজগারের বাধ্যবাধকতা পুরুষের উপর। নারী মুলত গৃহস্থালির কাজ এবং সন্তান পালনের কাজ করবে। তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে সে বাইরে কাজ করতেও পারে। পুরুষকেও গৃহস্থালির কাজে এবং সন্তান প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সেটা পুরুষের মূল কাজ না।

রেফারেন্স:

আল কুরআন

বুখারী শরীফ

মুসলিম শরীফ

https://m.dailyinqilab.com/article/179640/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-

%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%
https://www.minbarbd.com/article/1025
https://www.somoynews.tv/news/2024-11-21/SZ8UxMH4
https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=53503
https://dailyinqilab.com/islamic-life/article/643814